CONVOCATION SPEAKER

Ain o Salish Kendra (ASK)
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

Advocate Sultana Kamal
Executive Director
Ain O Salish Kendra

Message

I am greatly pleased to extend my congratulations to the 14th batch of graduating students of East West University.

It is an honor and privilege for me to share this auspicious moment of your life. Your success certainly speaks of your outstanding achievement, but there is a lot more to accomplish. Let us remember that education is the most powerful tool which we can use to change the world. You are in this case undoubtedly very special and you are the ones as education also means responsibility to create a prosperous world for the future.

On this occasion I wish you to march forward, take with you the lessons learnt in the university and make your dreams come true. I want you to believe that anything is possible when you completely believe in your ideals of non discrimination and respect for humanity. Always follow your dreams and see your dreams help others to have dreams. You might make mistakes; you might face obstacles in the pursuit of your dream, but never give up.

I convey my best wishes to the graduating students, the guardians, the parents and the East West family.

(Advocate Sultana Kamal)

ADDRESS OF THE
CONVOCATION SPEAKER

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
নির্বাহী পরিচালক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দশ সমাবর্তন উপলক্ষে সমাবর্তন বক্তার ভাষণ

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য চ্যান্সেলর, সম্মানীয় ভাইস চ্যান্সেলর, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ডীন, শিক্ষকবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, এবং আজকের সমাবর্তন উৎসব যাদের উপলক্ষ্য করে সেই শিক্ষার্থীবৃন্দ ।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দশ সমাবর্তন উৎসবে সমাবর্তন বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করছি। সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের সামনে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে কিছু কথা বলার সুযোগ যে কোনো কারো জন্য বিরাট গৌরবের বিষয়।

আজকে একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিনগুলি অতিক্রান্ত হচ্ছে। আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেকেই ঘর থেকে বার হয়েছি চরম অনিরাপত্তা বোধ নিয়ে। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ জনগণ, ছাত্রসমাজ, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ কেন প্রতিটি মুহূর্তে এই কষ্টের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হবে যে– যে কোনো মুহূর্তে তার উপরে যে কোনো বিপদ নেমে আসতে পারে? এ তো অত্যন্ত অন্যায্য এবং অগ্রহণযোগ্য পরিস্থিতি। কিন্তু একেবারেই অপ্রত্যাশিত কি? অপ্রত্যাশিত বলা যেতো তখনই যখন আমরা বলতে পারতাম মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত ধারায় চালিত হয়েছে।

আজকের বাংলাদেশ, যেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে ব্যবহার করা হয় জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসী কলাকৌশল, যে বাংলাদেশে ৭১-এর যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়, যে বাংলাদেশে ৭১-এর ঘাতক দালালেরা সদম্ভে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যায়, এমনকি জনগণেরই নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য, মন্ত্রী হয়ে লাল সবুজ পতাকার আশ্রয়ে সম্মানিত জীবন-যাপন করে তা কি মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ? ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যয়ে অর্জন করা স্বাধীন দেশ একটি বিশেষ ধর্মীয় চরিত্র ধারণ করে সাম্প্রদায়িকতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের নয়– সংখ্যালঘু বলে চিহ্নিত তারা ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে থাকে, আদিবাসীরা– কি পাহাড়ে কি সমতলে চরম অনিরাপত্তার মুখে দেশ ছেড়ে চলে যায়। মুক্তচিন্তার মানুষ রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রাস্তায় পড়ে মৃত্যুবরণ করে এবং উগ্রজঙ্গিশক্তি সদর্পে হত্যার দায় স্বীকার করে।

অন্যদিকে ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিকরাও অগণতান্ত্রিক পন্থাকেই এর বিপরীতে ব্যবহার্য্য কৌশল হিসাবে প্রয়োগ করার প্রবণতা প্রদর্শন করে। সাধারণ মানুষ ক্রমশ তার জীবনের শান্তি, নিরাপত্তা, আয়-উপার্জন, পড়াশুনা, স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার সর্বক্ষেত্রে এ ধরনের সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

একটি বহুল আলোচিত গ্রন্থে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। তথ্যটি এমন যে, কোনো একটি বিশেষ প্রাণী তার রূপান্তরের প্রক্রিয়ার কোনো একটি পর্যায়ে এসে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে আর সেই প্রাণী হয়ে উঠতে পারে না, অন্য এক প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। কোনো অবস্থাতেই এই প্রাণী আর তার মৌলিক চরিত্র ধারণ করতে পারে না। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে যেয়ে কেন যেন এ উপমাটার সাথে বড্ড বেশি মিল খুঁজে পাই। কেন একথা মনে হচ্ছে তার উল্লেখ সংক্ষিপ্ত আকারে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বরঞ্চ নিজেদের চিনে নিতে, উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে বলেই আমি মনে করি। এখানে আমারই লেখা সংবিধান স্মারক বক্তৃতা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

একাত্তরের ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পথ চলে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। বাংলাদেশের গণপরিষদ সংবিধান গ্রহণ করে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর যা বলবৎ হয় সেই বছরেরই ১৬ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে।

১৯৭২ সালে আমরা যে সংবিধান পেলাম তা তৈরি হয়েছিল এদেশের মানুষের ১৯৫২ সাল থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে। আমরা দাবী করি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল উৎস হচ্ছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন– যেখানে আমরা নিজের ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা দাবী করেছিলাম, নিজেকে তৈরি করতে চেয়েছি নিজের সংস্কৃতির আলোয়, চেয়েছি আমি যা– সেই পরিচয়েই নিজের দেশের মাটিতে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার। এটি আমার জন্য যেমন সত্য তেমনি তা অন্যের জন্যও সমান সত্য হোক– এমনটিই চেয়েছি আমরা। তাইতো ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃত।

সেই চেতনার পথ ধরেই আমরা এগিয়েছি যার ধারাবাহিকতায় ষাটের দশকে আমরা সংগ্রাম করেছি সাংস্কৃতিক স্বাধীকারের জন্য। পরিষ্কার ভাষায় বলেছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সর্বজনীন এবং অবশ্যই অসাম্প্রদায়িক। কথাটা অন্যভাবে বললে, আমরা নিজেদের কোনো বিশেষ একটি খণ্ডিত পরিচয়ের গণ্ডিতে বাঁধতে চাই নাই। আমরা নিজেদের বলেছি "মানুষ হও"। কায়মনে বাঙালি হলেও মানুষ হওয়া থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

তাই আমাদের সংবিধান, যার একটি আভিধানিক অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের সংগঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি–

সহজ ভাষায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন– সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চারটি নীতির অন্যতম হিসাবে স্থান পেয়েছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা। অন্য তিনটি হল– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র।

তবে একথা সত্য যে, ইতিহাস বাংলাদেশের প্রতি সদয় ছিল না। এতো সংগ্রাম, এতো আন্দোলন, এতো ত্যাগ, এতো প্রাণক্ষয় অথবা প্রাণদানের ওপর নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ চলে যায় সেনা দখলে। অথচ বাংলাদেশের মানুষ সেনা শাসনের বিরূদ্ধে তাদের মতামত জানিয়ে দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম উপাদান হিসাবে, ৬৯-এর গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীন দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। জেলখানায় রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকা জাতীয় চার নেতাকে কাপুরুষজনোচিতভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে কিছু সংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ন্যাক্কারজনকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। প্রশ্ন জাগে এক কলমের খোঁচায় পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা উড়িয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে নতুন কিছু সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানকে সঙ্কুচিত করে কেমন বাংলাদেশ তারা কায়েম করতে চেয়েছিল?

বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তার ক্ষেত্রে যেখানে একমাত্রিক পরিচয় থেকে বহুমাত্রিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেখানে এমন পরিবর্তন আনা হলো যে দেশটি স্পষ্টতই একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দেশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করল। কৌশলটি, ধারণা করা যায়, নেওয়া হয়েছিল হত্যাকান্ডগুলিকে একটি নৈতিক প্রতিরক্ষার ঢালে আড়াল করার জন্য। অপর কৌশলটি ছিল আইন কেন্দ্রিক। উদ্দেশ্য ছিল "ইনডেমনিটি" শীর্ষক ব্যবস্থাটি গ্রহণ করে হত্যাকারীদের বিচারের আওতা থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া।

১৯৭৮ সালের পঞ্চম সংশোধনীর পর আর এক সামরিক শাসকের সংশোধনী এলো অষ্টম সংশোধনীর নামে। ঘোষণা করা হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম। এদেশের মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ, ধর্মভীরু। কিন্তু ধর্মান্ধতাকে তারা কখনও নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করেনি বরং কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকেই তারা বারবার জানান দিয়েছে হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ দর্শনকেই তারা জীবনের নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

তবে এই মুহূর্তে জনগোষ্ঠীর বিন্যাসে আমরা একটা আশাপ্রদ অবস্থানে আছি। জনসংখ্যার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ শতাংশ হচ্ছে এদেশের যুব সমাজ, যাদের বয়স ১০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। একটি জরিপে তারা জানিয়েছে যে, তাদের চাহিদা হচ্ছে সুশিক্ষা, উন্নততর স্বাস্থ্য সেবা, চাকরি অথবা স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ, পুষ্টিকর খাদ্য এবং সৎ ও দায়িত্বশীল সরকার।

এ বিশাল সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী, যা বাংলাদেশের সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে, তাদের সামনে কঠোর বাস্তবতা হচ্ছে তাদের চাহিদার অধিকাংশই পূরণ হচ্ছে না। যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এদের জ্ঞান ও দক্ষতা আহরণ করতে হয় তা নানাভাবে বিভাজিত এবং বৈষম্যে জর্জরিত। শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে এ শঙ্কা প্রকাশ করা হয়ত একেবারে অমূলক হবে না যে, এরা সকলেই কি বৈশ্বিক মানের বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, যার সহায়তায় তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সমভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে? নারী শিক্ষার সুযোগ খর্ব করার ন্যাক্কারজনক পাঁয়তারাকে রাজনৈতিক সমর্থন জোগানো হয়েছে। লক্ষ শিশু এখনও বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারে না। তারা তো শিক্ষার ন্যূনতম মানও অর্জন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এই নবীন প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ, বাংলাদেশের একটি হিসাব অনুযায়ী যা দাঁড়ায় প্রায় দুই লক্ষে, তারা প্রতিবছর চাকরির বাজারে ঢোকার বয়সে পদার্পণ করছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই হয় চাকরি পাচ্ছে না, বা অনিয়মিত চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি সাধনে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঠিকই, তার পরেও উপযোগী স্বাস্থ্য সেবা সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে, এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, যথেষ্ট বিনিয়োগ বাড়ালে এই বয়সের জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বলিষ্ঠ জন-সম্পদ বেরিয়ে আসবে। প্রতিবেদনে যে সুপারিশ রাখা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে একেবারে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ সুপেয় পানি, মাধ্যমিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং যুব সমাজ যেন সামাজিক ও নীতি নির্ধারক ক্ষেত্রে সুদক্ষ অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয় এমন সুযোগ সৃষ্টিকারী কর্মসূচি। এজন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা।

এখন প্রশ্ন হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একটি সচেতন, দায়িত্বশীল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা কতখানি। সহজ উত্তর হতে পারে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক উপাদান। আমরা সবাই জানি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নীতি নির্ধারকেরা সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবেই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অতএব সেই জনগোষ্ঠীর সচেতনতা, দায়িত্বজ্ঞান, নাগরিকবোধ, দেশের প্রতি তার মনোভাব, নারী-পুরুষ এর সমঅধিকার, শিশুদের অধিকারের প্রতি মনোযোগ, মানবাধিকার, দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য সবকিছু মিলেই একটি জনগোষ্ঠীর চরিত্র চিহ্নিত হয় এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। জনগণের কাছে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা– তা তারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বেই থাকুক বা বিরোধীদলেই থাকুক একটি আবশ্যিক গণতান্ত্রিক শর্ত। তখনই প্রকৃতপক্ষে সুশাসনের আশা করা যায়। এখন আসি– এ বিরাট কর্মযজ্ঞে যুব সমাজের কি ভূমিকা থাকতে পারে? এ কথা তো আমাদের অজানা নয় যে ১৮ বছর বয়সে একজন ব্যক্তি ভোটের অধিকার প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে তার মতামত গ্রাহ্য হতে শুরু করে। অতএব পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার

দায়-দায়িত্ব তার উপরও যেয়ে বর্তায়। সেই ক্ষেত্রে একজন নাগরিক হিসাবে তার যে সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে, তার সুষ্ঠু ব্যবহারের নৈতিক দায়িত্ব বহন করাও তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দীর্ঘদিন অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে বাস করে করে, ইতিহাস বিকৃতির প্রভাবে এদেশের সাধারণ মানুষ, মূলত যুব সমাজ নীতিনির্ধারণের সাথে তার সম্পৃক্ততা খুঁজে পায় না বলে বিচ্ছিন্ন, হতোদ্যম এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, যারা শুধু মাথা নীচু করে, দুর্নীতি, হতাশা আর শঙ্কার মধ্যে জীবন যাপন করাকেই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ সহজ বা মসৃণ হয়নি কখনও। এখনও তা সহজ নয়, কিন্তু ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের ঋণের উপর দাঁড়িয়ে থেকে এ দায় থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখারও কোনো ন্যায্যতা আছে বলে মেনে নিতে পারি না। মাঝে মাঝেই এ পথে বাধার সম্মুখীন হতে হবে, অন্ধকার নেমে আসবে, তবে তার অবসান অনেক বেশি সত্য। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি, তিনি বলেন,

"কালো মেঘ আকাশের তারাগুলি ঢেকে ভাবে জিৎ হলো তার,
মেঘ কোথা ভেসে যায় চিহ্ন নাহি রেখে তারাগুলি রহে নির্বিকার।"

এ কথা ধরে নিলে ভুল হবে যে সুশাসন চাইলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে এবং সব চেয়ে বেশি করে যা মনে রাখতে হবে তা হলো– দল নির্বিশেষে দেশে যদি প্রগতিশীল, মুক্তচিন্তার সমর্থক, বহুমাত্রিক, পরমতসহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, সুশাসনের আশা বিফলেই যাবে। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, জঙ্গি, ধর্মান্ধ মৌলবাদী রাজনৈতিক ধারাকে সমর্থন দিয়ে কখনই গণতন্ত্র পাওয়া যাবে না, যেখানে যুব সমাজের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটবে। আমরা আজ একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছি। মহাকাশের দূরতম প্রান্ত থেকে মহাসাগরের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত আজ একুশ শতকের মানুষ তার নিজের আওতায় নিয়ে এসেছে।

সেই মানুষের তো কূপমন্ডুক, গণতন্ত্রবিরোধী, সামরিকতন্ত্রী ও জঙ্গিবাদী ধারাকে সমর্থন দেওয়া শোভা পায় না। একুশ শতকের সূচনায় কবি সুফিয়া কামাল যুব সমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন "সকল অনাচার, অবিচার দূর করতে তোমরা মুক্ত ধারার মতো বেরিয়ে এসো।" তিনি আরও বলেছিলেন "একুশ শতকের মানুষেরা যদি মানবধর্ম পালন না করে তাহলে একুশ শতকের মূল্য নেই।"

তাই একুশ শতকের মানুষদের হতে হবে সাহসী এবং গণতন্ত্রের রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হতাশা আর কর্মবিমুখতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে, হতে হবে সাহসী, উদ্যমী। তাদের বলি আবারও রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে, "তোল আনত শীর, ত্যাজোরে ভয়ভীতি"–

দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ কর, যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন–

"বন্ধু তোমার ছাড় উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।"

এ মাটিই কিন্তু আমাকে দিয়েছে আমার পরিচয়, আমার পতাকা, আমার জাতীয় সঙ্গীত। এ মাটিই আজ আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষার ধাপ পেরোবার সুযোগটুকু করে দিয়েছে। তাই সে মাটির ঋণ শোধ করার তাগিদ কখনই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাই সদাসর্বদা নিজেকে বলি যা আজ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই–

"My heart wants to help a little, because I was helped much"

কখনও কখনও বিফল মনোরথ হয়ে যাই, মনে হয় এতদিনের এত সাধনা, এত কাজ সেরকম তো সুফল এনে দিলো না। কিন্তু আবার যখন উজ্জ্বল এক ঝাঁক নতুন প্রজন্মের বন্ধুদের দিকে তাকাই, তখন মনে আসে সাফল্যের শেষ প্রান্তে আমার, আমাদের যাওয়া হলো না হয়ত, কিন্তু সামনে যারা আছে তারা তাদের নিষ্ঠা দিয়ে, দেশপ্রেম নিয়ে, মানবপ্রেমে অভিষিক্ত হয়ে সেই সফলতা, সেই সার্থকতার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে ঠিকই। সেই আশায় নতুন প্রজন্মের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলি, রবীন্দ্রনাথকেই উদ্ধৃত করে–

"আমার নাইবা হলো পারে যাওয়া,
যে হাওয়াতে চলত তরী, অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া।
নেই যদি বা জমল পাড়ি, ঘাট আছে ত বসতে পারি।
আমার আশার তরী ডুবল যদি দেখব তোদের তরী বাওয়া।"

আজকে যারা সনদপ্রাপ্ত হচ্ছেন সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং অশেষ শুভকামনা। যারা এতক্ষণ ধরে আমার বক্তব্য শুনেছেন তাদের জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।